ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1004-1009
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.097

উপনিষদের আলোকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক: একবার ফিরে দেখা

ড. ব্রততী চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The all-round development of a society depends on proper education. The implementation of proper education mainly depends on two factors- Student and Teacher. Healthy and comfortable partnership of these two moves the education process forward. In the present time the society is not getting the benefits of that education. But the history of this India bears witnesses to a fair education system where the thirst for knowledge of students has been satisfied by the unstinting education of fatherly Brahmavid gurus, and a healthy and normal society has been created. In the Upanishadic era, we see the student as a disciple and the teacher is known as a Guru or Acharya. The Upanishads inform us about the minimum qualifications that a student needs to have in order to acquire knowledge. The Upanishads advise a five-year-old boy to enter Brahmacharya. This was a must for all children. One of the qualifications of a student was his inquiring mind. Apart from this the Brahmacharya, Tapah and Sraddha were also the qualities of students. Their education was completed in the presence of the Brahmavid Guru. The characteristics and duties of the Guru have been discussed in the Upanishads. The Guru lights the fire of knowledge in the heart of the disciple. The Upanishads do not say that the Guru should be only a Brahmin who knows the Vedas. We see many people like Brahmins, Kshatriyas, kings, ordinary householders, fathers, husbands, etc. as Guru. Even examples of learning from non-humans are found in the Upanishads.

Keywords: *Shishya, Guru, Brahnacharya, Upanayana, Jijnasa, Sraddha etc.*

কোন সমাজ তথা সামাজিকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষার মাহাত্ম্য অপরিসীম। সামাজিকেরা যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হন তাহলে সেই সমাজ হবে রুচিশীল, প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু এর বিপরীত হলে সেই সমাজের অবক্ষয় অনিবার্য। তাই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে, যখন চারিদিকে দুর্নীতি, অরাজকতা, মূল্যবোধহীনতা সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। এই সুশিক্ষার বাস্তবায়ন দুটি বিষয়ের ওপর মূলতঃ নির্ভর করে। প্রথম হল শিক্ষার্থী এবং দ্বিতীয় শিক্ষক। প্রথমজন জ্ঞানপ্রার্থী এবং অন্যজন জ্ঞানদাতা। এই দুইয়ের প্রাঞ্জল, সচ্ছন্দ অংশীদারিত্বে শিক্ষা প্রক্রিয়াটি এগিয়ে চলে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে উন্নত যুগোপযোগী করার জন্য অনুসৃত হচ্ছে নানান বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি, সংশোধিত করা হচ্ছে পাঠ্যক্রম, মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিমাপ করা হচ্ছে শিক্ষার মানের। কিন্তু এত কিছুর পরও সেই শিক্ষার কোন চিহ্ন মানুষের জীবনচর্যায় ছাপ ফেলে না। সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি মগজস্থ হচ্ছে কিন্তু আত্মস্থ হচ্ছে না। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে নানান কৌশল। তৈরি করা হচ্ছে মেন্টর-মেন্টি গ্রুপ যেখানে শিক্ষক মেন্টরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধাগুলির খেয়াল রেখে তাদের প্রতিকূলতাগুলিকে দূর করার প্রয়াস করছেন । কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এই

আরম্বরের মধ্যেও থেকে যাচ্ছে প্রাণের অভাব, স্বাচ্ছন্দের অভাব। যার ফলস্বরূপ সেই শিক্ষার সুফল পাচ্ছে না বর্তমান সমাজ। কিন্তু এই ভারতবর্ষের ইতিহাসই সাক্ষ্যবহন করে এমন এক সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার যেখানে পিতৃতুল্য ব্রহ্মবিদ গুরুদের কার্পণ্যরোহিত বিদ্যাদানে তৃপ্ত হয়েছে শিষ্যের জ্ঞানপিপাসা, রচিত হয়েছে এক সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। মানব সমাজের ঘটে যাওয়া উত্থান-পতন, উন্নতি-অবক্ষয়, ভালো-মন্দ সবকিছুই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যদর্পণে। তাই একটি সমাজকে জানার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো সাহিত্য। আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি -এই সমস্ত কিছুর ইতিহাস বিবৃত রয়েছে আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে। এই বৈদিক সাহিত্যে অবগাহন করলে জানতে পারা যায় তৎকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি, গুরু ও শিষ্যের স্বরূপ এবং তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে। 'বৈদিক সাহিত্য' শব্দবন্ধ উচ্চারিত হলে বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই চারটি ভাগের কথা মানসপটে ফুটে ওঠে। এদের মধ্যে প্রথম দুইয়ের সমাহার 'কর্মকাণ্ড'রূপে এবং অবশিষ্ট দুটি 'জ্ঞানকাণ্ড'রূপে সর্বজনবিদিত। বৈদিক আচারসর্বস্ব যজ্ঞাদিক্রিয়া ও তাদের বিধি-বিধানের অন্তরালে ঋষিকবির অন্তরে যে জ্ঞানতৃষ্ণার জন্ম হয়েছিল তা আরণ্যকে পরিবর্ধিত হয়ে চরিতার্থ হয় উপনিষদে। বেদান্ত নামে খ্যাত উপনিষদের এই নামকরণ যে শুধুমাত্র বেদের অন্তিমে বা শেষে অবস্থানের জন্য হয়নি সে বিষয়ে সহৃদয় পাঠককুল অবশ্যই অবগত। 'অন্ত' পদটি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বে পর্যবসিত। সমগ্র বেদে বর্ণিত জ্ঞানরাজির সারাৎসার, সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান বিধৃত এই উপনিষদে। বৈদিক তথা ঔপনিষদীয় শিক্ষাপদ্ধতি গুরুশিষ্যপরম্পরাকে অনুসরণ করে। উপনিষদ্ শব্দটিই তার সাক্ষ্য বহন করে। উপ ও নি উপসর্গযোগে সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে গঠিত 'উপনিষদ্' পদটি। উপ উপসর্গের অর্থ সত্বর বা সামিপ্য, নি উপসর্গ নিশ্চয় বা নিঃশেষ অর্থকে দ্যোতিত করে। সদ্ ধাতুর নানা অর্থের মধ্যে বিশরণ অর্থাৎ গতি বা প্রাপ্তি, অবসাদন, বিনাশ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ব্যুৎপত্তিলব্ধ একাধিক অর্থের মধ্যে[১] এটিও গ্রহণযোগ্য – শিষ্য গুরুর সমীপে উপগত হয়ে নিঃসংশয়চিত্তে যে জ্ঞান গ্রহণ করে বা প্রাপ্ত হয় তাই উপনিষদ্। Paul Deussen- এর ভাষায়- Upanisads means a confidential secret sitting. একাগ্রতা বিঘ্নকারী সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে একান্তে নিভৃতে গুরুসমীপে উপবিষ্ট হয়ে অভিজ্ঞ আচার্যের কাছে শিষ্য জ্ঞানার্জন করবে। যে কোনও বিষয়ে ব্যুৎপন্ন, সুদক্ষ হতে হলে এই একান্তবাস আজকের যুগেও সমান প্রয়োজনীয়। কেমন ছিল সেই গুরু ও শিষ্যের স্বরূপ? জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদান করতে গেলে কোন কোন গুণাবলীর আধিকারী হতে হতো তাদের? এই সমস্তই বিধৃত রয়েছে উপনিষদ্ সাহিত্যে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা কিছু প্রধান উপনিষদ্সমূহে বিধৃত বিভিন্ন আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে ঔপনিষদীয় যুগের গুরু-শিষ্যের স্বরূপ ও তাদের কর্তব্যের প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াস করব। এখানে মূলতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য উপনিষদের আলোচনাও করা হয়েছে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষের অজ্ঞানকে দূর করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করা। প্রকৃত সুশিক্ষা একদিকে যেমন অজানাকে জানতে, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করে এক সুন্দর সমাজ গড়তে সহায়ক হয়। একজন মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে যেমন জ্ঞানার্জন করতে পারে, তেমনি জীবনে চলার পথে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যও তাকে অজানা থেকে জ্ঞানের মার্গে নিয়ে যায়। এই দুইয়েরই সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদে। তবে দুটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের, একজন জ্ঞানপ্রার্থী আর অন্যজন জ্ঞানদাতা। প্রথমজন বিনম্রচিত্তে, শ্রদ্ধাশীল হয়ে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে উপস্থিত হবে জ্ঞানবৃদ্ধ, পিতৃতুল্য আচার্যের কাছে, যিনি নিজের প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করবে শিষ্যের জীবন, নিরসন করবেন তার সমস্ত জিজ্ঞাসা। এই চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে উপনিষদ্-দর্পণে। প্রথমেই আমরা অলোকপাত করব শিক্ষার্থী বা শিষ্যের বিষয়টিতে। জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় শিক্ষক বরিষ্ঠ হলেও শিক্ষার্থীর আলোচনা প্রথমে করার যথার্থ কারণ বিদ্যমান। একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমরা সম্মান করি, সমাজ তাঁকে পণ্ডিত, সজ্জন ইত্যাদিরূপে সম্বোধিত করে, কিন্তু তিনি একজন শিক্ষক বা গুরুরূপে চিহ্নিত হন তখনই যখন তার সান্নিধ্যে আসে কোন জিজ্ঞাসু শিষ্য বা ছাত্র। শিক্ষার্থী বিদ্যাগ্রহণার্থে গুরুসমীপে এলে তবেই তার শিক্ষকসত্ত্বা জাগরিত হয়। তাই যে একজন প্রাজ্ঞকে শিক্ষক বা গুরু করে তোলে তার আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। তাই প্রথমে আমরা উপনিষদে বর্ণিত শিক্ষার্থীর স্বরূপ আলোচনা করব।

বর্তমানে আমরা শিক্ষার্থী বা ছাত্র পদের দ্বারা যাদের বুঝি উপনিষদ্ ও তার সমসাময়িক কালে তাদের আমরা 'শিষ্য'রূপে দেখি। কোনও কোনও স্থলে 'অন্তেবাসী' পদের প্রয়োগ দেখা যায়।[২] বিদ্যাগ্রহণকালে শিষ্য গুরুগৃহে গুরুর নিকটে বাস করত বলে সে অন্তেবাসী। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষাগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই দুই পদ্ধতিতেই সম্ভব ছিল। দুটি ক্ষেত্রেই শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। তাদের সেই জ্ঞানের অধিকারী হতে হতো। ফলে স্বামীত্বকে বলে অধিকার, সেই স্বামীত্ব বা প্রভূত্ব যে অর্জন করে সেই অধিকারী।[৩] পাত্র যদি ছিদ্রাদি ত্রুটিযুক্ত হয় তাতে যতই উন্নতমানের জল রাখা হোক, সেই জল যেমন ক্ষরিত হবেই ঠিক তেমনি অধিকার বা যোগ্যতাহীন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও উত্তম শিক্ষাও কার্যকরী হবে না। তাই উপনিষদ্ বারংবার শিষ্যের যোগ্যতার কথা সুনিশ্চিত করেছেন। শিষ্য গুরূপদিষ্ট জ্ঞান গ্রহণে, গৃহীত জ্ঞান ধারণে এবং সেই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগে যোগ্য কিনা এই বিষয়গুলিই তার যোগ্যতা বা অধিকারের পরিমাপক।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে সেই সময় গুরুগৃহ নির্দেশিত। এই শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে আবাসিক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সময় পঞ্চবর্ষীয় বালককে সঁপে দেওয়া হত গুরুর হাতে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষের জন্য। জীবনের যে অধ্যায়ে মন থাকে কালিমামুক্ত, নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে সর্বাধিক, বুদ্ধির উপর মিথ্যার আবরণ যখন থাকে না সেই শৈশব ও যৌবনকালকেই বিদ্যালাভের কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যালাভের এই সময়কাল যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদে। সেখানে প্রায় দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ শ্বেতকেতুর বিদ্যাগ্রহণের আগ্রহ উৎপন্ন না হওয়ায় পিতা আরুণি চিন্তিত হন এবং পুত্রকে বলেন- 'শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং'। কারণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মে বেদাধ্যায়নের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী না হলে তা নিন্দনীয়। লোকে সে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলে পরিচিত হবে, ব্রাহ্মণ নয়। তাই শ্বেতকেতু গুরুগৃহে চব্বিশ বছর পর্যন্ত বেদাধ্যয়ন করে ফিরে আসে। এর থেকে জ্ঞাত হয় যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সময়সীমা দ্বাদশ বৎসর। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্য নয়, রাজার সন্তান থেকে সাধারণ গৃহস্থের সন্তান, পুত্র কন্যা সকলের জন্যই পালনীয় ছিল।[৪] সমাজের সকলের বিদ্যালাভে অধিকার ছিল বলেই পিতৃপরিচয়হীন জাবাল সত্যকামের বিদ্যালাভ সম্ভব হয়েছিল। তাই সত্যকাল গৌতমের কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলে গৌতম যখন তাঁর গোত্র জানতে চাইলেন তখন সত্যকাম বলে যে সে মাতা জবালির সন্তান, পিতার গোত্র তার অজানা। তার এই সত্যভাষণে প্রীত হয়ে গুরু গৌতম তাকে তৎক্ষনাৎ শিষ্যত্বে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হন।[৫]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আগত ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য হল উপনয়ন। 'উপ' অর্থাৎ সমীপে 'নয়ন' অর্থাৎ আনয়ন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে নবাগত, প্রাপ্তি হয় শিষ্যত্বের। এখন থেকে তার সমস্ত দায়িত্ব গুরুর। গুরুর এই একান্ত সান্নিধ্য যে কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন বা ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনার জন্য আবশ্যক তা নয়, এর দ্বারা গুরুর ব্যক্তিত্বের ও জীবনচর্যার প্রভাব পড়ত শিষ্যের জীবনে। অধ্যয়নের পাশাপাশি চলতে থাকত দৈনন্দিন কার্যাবলি, যেমন- সমিধ আহরণ, পশুচারণ, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্তব্য তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়ক হত। ভিক্ষান্নের দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তির ফলে অন্নের মাহাত্ম্য অনুভূত হত। সমস্ত বাহুল্যকে বর্জন করে পরিমিতে জীবনযাপনের শিক্ষায় শিক্ষিত হত তারা। সকলের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে সৌহার্দ্য, মৈত্রী, সহযোগিতা, সহমর্মীতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলিও বিকশিত হত। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত গুরূপদিষ্ট পথে জীবনযাপন শিষ্যের কর্তব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। উপনিষদে প্রতিপাদিত গুরুশিষ্যপরম্পরাদ্যোতক বিভিন্ন কাহিনীগুলি বিচার করলে শিষ্যের কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেগুলি শিষ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল জিজ্ঞাসু মন। শিষ্যের জানার ইচ্ছা হতে হবে স্বতোৎসারিত। তবেই শিক্ষা হবে ফলপ্রসু, অন্যথায় তা হবে নামমাত্রে পর্যবসিত। যেমন- শ্বেতকেতুর ব্রহ্মচর্যপালন স্বেচ্ছায় ছিল না, পিতার ইচ্ছা পূরণার্থে সে গুরুগৃহে গিয়েছিল, লোকনিন্দা থেকে নিজের বংশকে রক্ষা করার জন্য। ফলে বিদ্যালাভ করা সত্ত্বেও তার চরিত্রে তার ইতিবাচক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি। তাই পিতা লক্ষ্য করেছেন ছেলের পাণ্ডিত্যাভিমান। বলা হয়েছে- 'স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচায়মানী স্তব্ধ এয়ায়'।[৬] শ্বেতকেতুর আচরণে 'মহামনা' অর্থাৎ নিজের মনকে উন্নত ভাবা, নিজেকে পণ্ডিত মনে করা এবং অবিনয়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় যে সে সুশিক্ষিত হয়নি। সুতরাং শিক্ষার্থীর জানার ইচ্ছা সহজাত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওই একই উপনিষদে আমরা আর একজন শিক্ষার্থীকে দেখতে পাই যার জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক হওয়ায় তাঁর

মধ্যে গুরু লক্ষ্য করেছেন ব্রহ্মতেজ- 'ব্রহ্মবিদেব বৈ সৌম্য ভাসি'। সত্যকাম গুরু গৌতম প্রদত্ত চারশ গাভী নিয়ে চার সহস্র গাভী ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে দীর্ঘ অরণ্যবাস করে। তার তপস্যায় অভিভূত হয়ে স্বয়ং প্রকৃতি তাকে নানা রূপে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। তৎসত্ত্বেও গুরূপদিষ্ট না হওয়ায় তিনি নিজেকে ব্রহ্মবিদ মনে করেন নি। পরবর্তীতে গুরুর উপদেশ লাভ করে সে কৃতার্থ হয়।[৭] শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই শিষ্যের উক্ত গুণ আবশ্যক এমন নয়, যে কোন ক্ষেত্রেই জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক হলে তবেই তা ফলপ্রসু হয়। যেমন বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর অমৃতত্বের স্বাভবিক জিজ্ঞাসা [৮] তাকে আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিদ করে তুলেছে। তাই সংসারত্যাগোদ্যত যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়া মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন।

'ব্রহ্মচর্য'[৯] কে শিক্ষা বা বিদ্যালাভের জন্য শিষ্যের গুণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বারংবার। শৈশবে গুরুগৃহে বাস করে প্রথাগতভাবেই হোক বা কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্যই হোক, ব্রহ্মচর্যের কথা বারবার বলা হয়েছে উপনিষদে শিক্ষার প্রাক্‌শর্ত হিসাবে। যেমন- প্রশ্নোপনিষদে সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়ণি, কৌশল্য, বৈদর্ভী ও কবন্ধী – এই ছয়জন ব্রহ্মপরায়ন ব্যক্তি পরব্রহ্মের জ্ঞানের নিমিত্ত পৈপল্লাদ ঋষির কাছে উপস্থিত হলে ঋষি বলেন- 'ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ'। তপস্যা, শ্রদ্ধার সঙ্গে একবছর ব্রহ্মচর্য পালন করার কথা বলেন ঋষি, তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসার অধিকারী হবেন তারা। তারা সকলেই একবছর ব্রহ্মচর্যের পালন করে নিজেদের প্রশ্নগুলি মহর্ষি পৈপল্লাদকে করেন ও তাদের জিজ্ঞাসার নিরসন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গেলে সেখানে তারা দুজনে বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন বাস করেন।[১০] বৃহদারণ্যকে বর্ণিত প্রজাপতির তিন সন্তান- দেবতা, মানুষ ও অসুর প্রজাপতির থেকে উপদিষ্ট হওয়ার জন্যও ব্রহ্মচর্যের পালন করেছিলন, তবেই তারা উপদিষ্ট হন। সুতরাং গুরু বা আচার্যের উপদেশলাভের পূর্বশর্ত শিষ্যের ব্রহ্মচর্য যাপন।

ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে শিষ্যের মধ্যে তপস্যা ও শ্রদ্ধা থাকা কাঙ্খিত। 'তপ্' ধাতুনিষ্পন্ন তপস্যা শব্দের দ্বারা মূলত শ্রমসাধ্য আপাতকঠিন কাজকে বোঝায় যা শরীরে তাপের সঞ্চার করে। তপস্যা হল কায়িক, বাচিক ও মানসিক কৃচ্ছসাধন, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে জীবনে স্থিরতা আসে। অপরপক্ষে 'শ্রদ্ধা' হল গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তাই উপনিষদের সর্বত্র শিষ্যের আচরণে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদের সারাৎসার গীতাতেও শ্রদ্ধাবানের প্রশংসা করে বলা হয়েছে-

'শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/৩৯

উক্ত গুণযুক্ত শিষ্য সমিধপাণি হয়ে সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট হয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করবে। সমিধ হল যজ্ঞার্থে আহরিত কাষ্ঠখণ্ড। শিক্ষারম্ভে সমিধ নিয়ে যাওয়া বিষয়টি প্রচলিত প্রথাকে অনুসরণ করে যার একটি অন্তর্নিহিত অর্থ বিদ্যমান। কাঠ যেমন যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিকে প্রজ্বলিত হতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি গুরুর সান্নিধ্যও শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বলিত করবে, যার আলোকে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার, অজ্ঞান দূরীভূত হবে। শিষ্যের হৃদয়ের সমস্ত সংশয়, দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করে তাকে সুশিক্ষার পথে চালিত করেন যিনি তিনিই শিক্ষক, শিক্ষাগুরু। শিক্ষক হলেন সেই কারিগর যিনি পথপ্রান্তে পড়ে থেকে মৃত্তিকাখণ্ডকে ব্যবহারোপযোগী পাত্রে পরিণত করতে সক্ষম। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জলসিঞ্চনে কোমলমতি শিশুকে সুমানব করে তোলেন। বর্তমান যুগের শিক্ষক উপনিষদে গুরুরূপে সুবিদিত। গুরুর গুণাবলী ও শিষ্যের জীবনে তার ভূমিকা আলোচনার পূর্বে গুরু কে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। 'গৃণাতি উপদিশতি ধর্মং গিরত্যজ্ঞানং চ' অর্থাৎ যিনি ধর্মের উপদেশের মাধ্যমে অজ্ঞানকে তিরোহিত করেন তিনিই গুরু। আগমসার গ্রন্থে পদবিশ্লেষণের মাধ্যমে গুরুর ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। গুরু পদের গকার সিদ্ধিদায়ক, রকার পাপসমূহের দাহক এবং উকার শিব বা মঙ্গলকামী। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের মাধ্যমে শিবের সাথে নিজের অভেদজ্ঞান করান তিনিই গুরু।[১১]

নামের দ্বারাই শিষ্যের জীবনে গুরুর ভূমিকা প্রতীত হচ্ছে। ঔপনিষদীয় যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকালে অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরু 'আচার্য'রূপে অভিহিত। উপনীত দ্বিজটিকে আচার্য নিজপুত্রজ্ঞানে পালন করতেন। তিনি হবেন

সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী, 'শোত্রিয়' অর্থাৎ যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সমস্তের জ্ঞাতা। তিনি সংযতচিত্ত, স্থিতধী, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও অহংকারশূণ্য। নিজের জ্ঞানের প্রতি অহংকার গুরু বা আচার্যের যে কাম্য নয় তার পরিচয় বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদে দেখা গেছে পাণ্ডিত্যাভিমানী বালাকির আত্মপ্রচার। তাকে সেখানে 'দৃপ্তবালাকি' বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। তিনি রাজা অজাতশত্রুর সভায় এসে রাজাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা সাগ্রহে তাকে আমন্ত্রন জানান উপদেশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্রমে রাজারা সঙ্গে তত্ত্বালোচনার পর তিনি নিজের জ্ঞানের সসীমতা অনুধাবন করেন এবং অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গুরু যে কেবলমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই হবেন সেই কথা বলে না উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজা, সাধারণ গৃহস্থ, পিতা, স্বামী প্রভৃতি অনেকেই গুরুরূপে নির্দেশিত হয়েছে। যেমন- পূর্বোক্ত বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত অজাতশত্রু একজন ক্ষত্রিয় রাজা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদে (৫/৩) শ্বেতকেতুর পিতা স্বয়ং গৌতম রাজা প্রবাহণের কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হয়ে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' আয়ত্ত্ব করেন। একই উপনিষদে প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদুম্ন, জন এবং বুড়িল নামে পাঁচজন মহাগৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ক্ষত্রিয়রাজা কৈকেয়পুত্র অশ্বপতির কাছে যান।[১২] ব্রহ্মবিদ জনক রাজার নাম সর্বজনবিদিত। দেবতাও উপনিষদে গুরুরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন – কঠোপনিষদে স্বয়ং যম নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন, বৃহদারণ্যকে ও ছান্দগ্যে প্রজাপতি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যাথাক্রমে দেবতাদি সন্তানত্রয় ও ইন্দ্র-বিরোচনকে উপদেশ দিয়েছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পিতা বরুণ ভৃগুকে উপদেশ দিয়েছেন। সেই একই চিত্র দেখা যায় ছান্দোগ্যে যেখানে দাম্ভিক শ্বেতকেতুকে যথার্থ শিক্ষা দিতে পিতা আরুণি গুরুরূপে অবতীর্ণ। মৈত্রেয়ীর গুরু তার নিজের স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গুরু কে হবেন তার নির্দিষ্ট কোনও বিধান ছিল না উপনিষদের কালে। নিরহংকার জ্ঞানী ব্যক্তি যোগ্য জ্ঞানপ্রার্থীকে জ্ঞানোপদেশ দিতেন। কেবলমাত্র মানুষ নয়, মনুষ্যেতরের কাছেও শিক্ষালাভের নিদর্শনও পাওয়া যায় উপনিষদে। সত্যকামকে অগ্নি প্রভৃতি প্রকৃতির অংশ ব্রহ্মোপদেশ দিয়েছিল।

গুরু হবেন পক্ষপাতশূন্য। তিনি সকলকে সমান উপদেশ দান করবেন। শিষ্য তার নিজের সামর্থ অনুযায়ী সেই উপদেশ গ্রহণ করবে। তাই পিতা প্রজাপতি তাঁর তিন সন্তান- দেবতা, মানব ও অসুরকে 'দ-দ-দ' এই একই উপদেশ দিয়েছিলেন। তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ি অর্থগ্রহণ করে। দেবতারা গ্রহণ করেন- 'দাম্যত', মানবেরা- 'দত্ত' এবং অসুরেরা গ্রহণ করে 'দয়ধ্বম্' অর্থ। এই হল অধিকারীভেদে উপনিষদের শিক্ষার এক অসামান্য নিদর্শন। দেবতারা অসীম ক্ষমতাশালী, তাই তাদের নিজেকে দমন করার উপদেশ। কামনাজর্জরিত মানবের লোভ প্রশমনের জন্য দানের উপদেশ এবং পেশীশক্তিতে বলীয়ান অসুরদের জন্য দয়ার উপদেশ। এই শিক্ষা সর্বকালের জন্য প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞানারণ্যে গুরু প্রদীপতুল্য। গুরু শিষ্যকে জানতে সহায়তা করবেন, তার জানার পথের বাধাগুলিকে সরিয়ে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে দেবেন। জানতে হবে শিষ্যকে নিজেই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে আরুণি শ্বেতকেতুর দৃষ্টান্তে জ্ঞান অর্জনে গুরুর ভূমিকা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরুণি বলেছেন— গান্ধার দেশের কোন এক ব্যক্তিকে চোখ বেঁধে দুষ্কৃতিরা লোকশূন্য অরণ্যে এনে পরিত্যাগ করে, তখন সেই ব্যক্তি দিক্‌ভ্রান্তের মত অনুভব করে। সেই সময় কোন এক করুণাময় পুরুষ এসে তাকে বন্ধনমুক্ত করে উপদেশ দেয়— 'এতাং দিশাং গান্ধারা এতাং দিশাং ব্রজেতি'। এইভাবে দিক দর্শিত হলে সেই ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের দেশে উপনীত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা সেই করুণাময় পুরুষ সদৃশ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন শিষ্যের চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাকে শিক্ষালাভের উপযুক্ত করে তোলা গুরুর কর্তব্য। শিখতে হবে শিষ্যকে নিজেই। গুরুর মুখোচ্চারিত উপদেশ শ্রবণ করে বিচারপূর্বক মননের পর বিষয়টিকে আত্মস্থ করা শিষ্যের কাজ। গুরু তাকে কিভাবে শিখতে হয়, জানতে হয় সেই পথের সন্ধান দেবেন। এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে ছাত্রকেই। নিজে শিখলে তবেই সেই জ্ঞানকে জীবনে প্রযোগ করতে সক্ষম হবে সে, নাহলে শিক্ষালাভ গলাদ্ধকরণ ও উদ্গীরণে পরিণত হবে।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে উপনিষদে বর্ণিত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই সমস্তকিছুর প্রতিফলন শিক্ষাক্ষেত্রে আবশ্যক। শিক্ষক হওয়ার অর্থ তার নিজের জানার পরিসমাপ্তি নয়, শিক্ষার্থী বা ছাত্রকে

শেখানোর মাধ্যমে তিনি পুনরায় সেগুলিকে জানবেন, তবে সেই জানা আগের থেকে উন্নততর। উপনিষদের শিক্ষা থেমে যেতে শেখায় না, জীবনের চলমানতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের উৎকর্ষতা সেখানে অভিপ্রেত। তাই ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সমতার সূর-

'ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বী নাবধীত্মস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ'।।[১৩]

তথ্যসূত্র:

১. যে বিদ্যা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একাত্মতা প্রতিপাদন করে কারণসহ সংসার-দুঃখ বিনষ্ট করতে পারে, তাই উপনিষদ্। অথবা, যা সত্বর গতিতে নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে নিয়ে যায়। অথবা, যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তন্নিষ্ঠ হয়ে নিঃসংশয়চিত্তে তার অনুশীলন করলে সেই বিদ্যাই অবিদ্যা প্রভৃতি দুঃখঘটক সংসারবন্ধনকে শিথিল করে বা নিঃশেষে বিনাশ করে।- বৃহদারণ্যক, কঠ ও মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যভূমিকা।

২. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪/১০/১।

৩. অধিকারস্তু ফলে স্বাম্যম্ অধিকারী চ তৎপ্রভূঃ।- সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৪. বেদে 'ব্রহ্মচারিণী' ও 'ব্রহ্মবাদিনী' নারীর উল্লেখ আছে। যে কন্যারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনের পর সংসারে গমন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতেন তাদের ব্রহ্মচারিণী বলা হত, যারা বিবাহাদি না করে মন্ত্রদ্রষ্টা হতেন তারা ব্রহ্মবাদিনী নামে পরিচিতা হতেন।

৫. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪/৪, সত্যকাম জাবাল আখ্যায়িকা।

৬. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪/১/২।

৭. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্, সত্যকাম জাবাল আখ্যায়িকা।

৮. সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং? যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রুহীতি- বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৩।

৯. যোগমতে সর্বদা কায়মনোবাক্যে মৈথুলের ত্যাগই হল ব্রহ্মচর্য- যোগসূত্র, সাধনপাদ।

১০. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮/৭/১।

১১. 'গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তোরেফঃ পাপস্য দাহকঃ।/ উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ।।
গকারোজ্ঞানসম্পত্যৈরেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।/উকারাৎ শিবতাদাত্মং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ।।

১২. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৫/১১।

১৩. অর্থাৎ আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্য) ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান, আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বিদ্যা-সামর্থ অর্জন করতে পারি, আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হোক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।- কঠোপনিষদ্ শান্তিপাঠ।

গ্রন্থপঞ্জী:

১.গোস্বামী, সীতানাথ (অনুবাদক), কঠোপনিষদ্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০২।

২.মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল, উপনিষদের অমৃত, শ্রী সারদা মঠ, কলকাতা, ২০১৩।

৩. বসু, নাগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), বাংলা বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লি, ১৯৮৮।

৪.সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ দূর্গাচরণ (সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা), ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ১ম ও ২য় ভাগ, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৪।

৫.সেন, অতুলচন্দ্র (সম্পাদক), উপনিষদ্ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০।